CENTRE
FOR HEALTH AND
POPULATION RESEARCH

HSB
স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা

বর্ষ ২ সংখ্যা ২ | আইএসএসএন১৭২৯-৩৪৩এক্স | জুন ২০০৪

ভেতরের পাতায় . . .

৫ ২০০৪ সালে ফরিদপুর জেলায় নিপা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের সময় ব্যক্তি-থেকে-ব্যক্তিতে এ-ভাইরাসের বিস্তার

১০ ডেঙ্গু হেমোরেজিক জ্বর সনাক্ত করতে বুক ও পেটের আলট্রাসাউন্ডের ব্যবহার

১৪ সর্বশেষ পর্যবেক্ষণ

আইসিডিডিআর,বি ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষিত রক্ত এবং স্নায়ুরস (সিএসএফ) থেকে প্রাপ্ত *নাইসিরিয়া মেনিনজাইটিডিস* -এর বৃদ্ধির হার, ১৯৯৯-২০০৩

১৯৯৯ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত পাঁচ বছরে আইসিডিডিআর,বি-তে পরীক্ষিত রক্ত ও স্নায়ুরস (সিএসএফ) থেকে দেখা গেছে যে, মেনিঙ্গোকোক্কাল মেনিনজাইটিস এবং মেনিঙ্গোকোক্কেমিয়া রোগের কারণ হিসেবে পরিচিত *নাইসিরিয়া মেনিনজাইটিডিস* জীবাণুর সংখ্যা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অপেক্ষাকৃত বেশি-বয়সী শিশু ও তরুণ-তরুণীদের মধ্যে ইনভ্যাসিভ মেনিঙ্গোকোক্কাল রোগটি বেশি দেখা গেছে। এ-জীবাণুটি পেনিসিলিন এবং সেফট্রিয়াক্সোনে সংবেদনশীল, তবে ক্রমান্বয়ে এজিথ্রোমাইসিন-প্রতিরোধক হয়ে চলেছে। কোট্রিমোক্সাজোল এখানে আদৌ কার্যকর নয়। রোগটির গতি-বিধি ও এর ফলে সৃষ্ট ঝুঁকির-পরিমাণ আরো সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ এবং সর্বাধিক উপযোগী প্রতিরোধ-কৌশল নির্ধারণের জন্য যেসব হাসপাতালে এধরনের রোগী বেশি ভর্তি হয় সেসব হাসপাতাল থেকে রোগী ভর্তি-সংক্রান্ত তথ্য ও জনসংখ্যা-নির্ভর উপাত্ত সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

আইসিডিডিআর,বি-র ক্লিনিক্যাল মাইক্রোবায়োলোজি ল্যাবরেটরিতে রক্তের কালচার ও স্নায়ুরস (সিএসএফ) পরীক্ষার ফলাফল পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে, *নাইসিরিয়া মেনিনজাইটিডিস*-এর সেরোগ্রুপ 'এ' জীবাণু দ্বারা সংঘটিত মারাত্মক সংক্রমণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি থেকে ২০০৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত আইসিডিডিআর,বি-তে পরীক্ষিত রক্ত ও স্নায়ুরসের রেকর্ডসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে আইসিডিডিআর,বি হাসপাতালের রোগীসহ ঢাকা শহরের অন্যান্য হাসপাতাল ও ক্লিনিক থেকে পাঠানো রোগীদের রক্ত ও স্নায়ুরসের নমুনা। কোনো রোগীর রক্তে বা স্নায়ুরসে *নাইসিরিয়া মেনিনজাইটিডিস* জীবাণু পাওয়া গেলে তাকে ইনভ্যাসিভ মেনিঙ্গোকোক্কাল রোগ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। জীবাণুসমূহের সেরোগ্রুপ করা হয় স্লাইড এগ্লুটিনেশন পদ্ধতির মাধ্যমে; এবং ওষুধের প্রতি এদের সংবেদনশীলতা পরীক্ষা করা হয় ডিসক্ ডিফিউসন পদ্ধতির মাধ্যমে [তবে কোট্রিমোক্সাজোল-এর সংবেদনশীলতার সর্বনিম্ন পরিমাণ (এমআইসি) পরীক্ষা করা হয় ই-টেস্টের মাধ্যমে]।

আইসিডিডিআর,বি:
সেন্টার ফর হেলথ্ এ্যান্ড পপুলেশন রিসার্চ
জিপিও বক্স ১২৮
ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
www.icddrb.org

গত ৫ বছরে ৭৬ জন রোগীর রক্তে ও স্নায়ুরসে *নাইসিরিয়া মেনিনজাইটিডিস* জীবাণু পাওয়া গেছে। ৭২ জন রোগীর জীবাণুর সেরোগ্রুপ পরীক্ষা করা হয়েছিলো। তন্মধ্যে ৭১টি জীবাণু (৯৮.৬%) ছিলো সেরোগ্রুপ 'এ' এবং মাত্র ১টি ছিলো সেরোগ্রুপ 'বি' শ্রেণীর। ৫৩ জন রোগীর রক্ত থেকে এবং ৩৪ জন রোগীর স্নায়ুরস থেকে মেনিনজাইটিস-এর জীবাণু পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে ১১ জন রোগীর রক্ত ও স্নায়ুরস উভয় নমুনা থেকেই এই জীবাণু পাওয়া গেছে। বেশির ভাগ (৮৫.৫%) ইনভ্যাসিভ মেনিঙ্গোকোক্কাল রোগ সনাক্ত করা হয় ২০০২-২০০৩ সালের মধ্যে, যদিও ১৯৯৯ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্তও প্রতিবছর প্রায় সমসংখ্যক নমুনা পরীক্ষা করা হয় (চিত্র ১)। সুতরাং, ২০০২ এবং ২০০৩ সালে রক্ত কালচার থেকে পাওয়া জীবাণুর সংখ্যা ২০০১ সালের তুলনায় ৫ গুণ এবং ১৯৯৯ ও ২০০০ সাল থেকে ৪০ গুণেরও বেশি ছিলো। যে ১,২৭৭টি স্নায়ুরস কালচার করা হয়েছিলো সেগুলোর মধ্যে শতকরা ২.৫ ভাগ মেনিনজাইটিস-এর জীবাণু পাওয়া গেছে। অনুরূপভাবে, ২০০২ এবং ২০০৩ সালে স্নায়ুরস থেকে প্রাপ্ত জীবাণুর হার ২০০১ সালের তুলনায় ৪ গুণেরও বেশি এবং ১৯৯৯ ও ২০০০ সালের তুলনায় ৬ গুণেরও বেশি ছিলো। পাঁচ বছরব্যাপী পর্যালোচনায় রক্ত অথবা স্নায়ুরস থেকে রোগের জীবাণু পরীক্ষা করার পদ্ধতি অথবা আইসিডিডিআর,বি হাসপাতালে ভর্তির নিয়মাবলীর মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিলো না।

চিত্র ১: রক্ত কালচারের মাধ্যমে নাইসিরিয়া মেনিনজাইটিডিস *সনাক্তকরণ, ১৯৯৯-২০০৩*

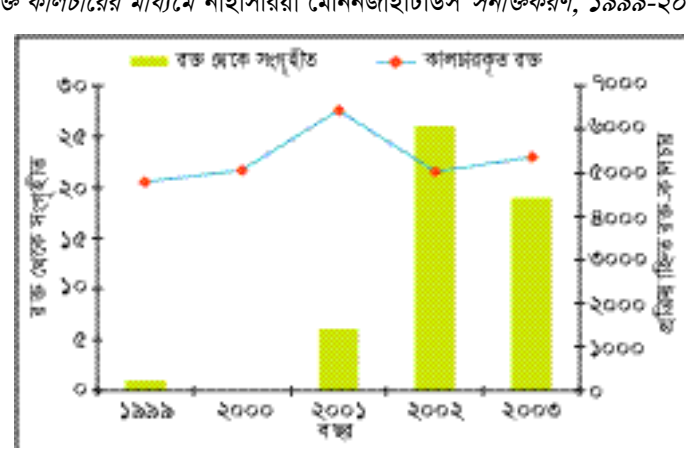

এ-পর্যন্ত প্রাপ্ত মোট উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে একথা বলা যায় যে, কোনো ঋতুগত সুস্পষ্ট পার্থক্য ছাড়াই মেনিঙ্গোকোক্কাল রোগ সারা বছরই দেখা যায় (চিত্র ২)। বেশির ভাগ (৫৯.২%) রোগীর বয়স ছিলো ১৫ বছর বা তার চেয়ে বেশি এবং ২৭.৬% রোগীর বয়স ছিলো ৬-১৪ বছরের মধ্যে। পাঁচ জন বাদে সব রোগীর বয়সই ছিলো ৪০ বছরের কম। ৬৪ জন রোগীর লিঙ্গ-সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া গিয়েছিলো। তাদের ৪৭ জন (৭৩.৪%) ছিলো পুরুষ।

১৫ বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সের রোগীদের মধ্যে লিঙ্গ-বৈষম্য ছিলো উল্লেখযোগ্য, যাদের মধ্যে ৮২.৫% ছিলো পুরুষ ।

চিত্র ২: মাস-ভিত্তিক ইনভ্যাসিভ মেনিঙ্গোকোক্কাল রোগীর সংখ্যা, ১৯৯৯-২০০৩

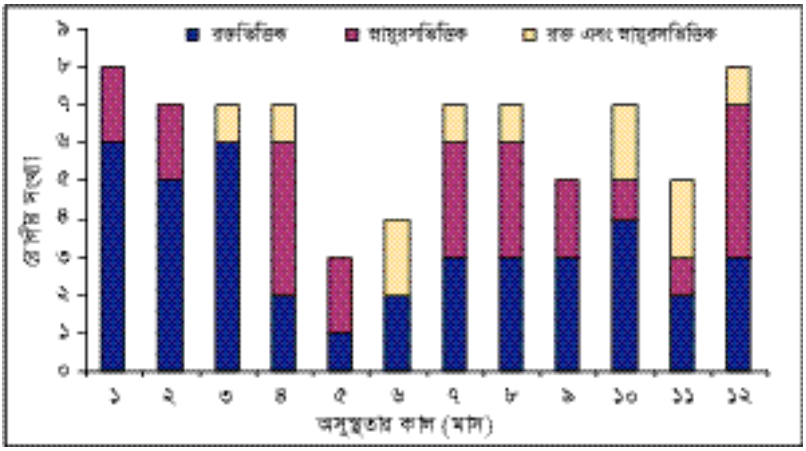

৮৩টি জীবাণুর সবগুলোই পেনিসিলিন, সেফট্রিয়াক্সোন এবং সিপ্রোফ্লোক্সাসিনে সংবেদনশীল ছিলো। মনে হচ্ছে এজিথ্রোমাইসিন-প্রতিরোধক হওয়ার বিষয়টি সম্ভবত সাম্প্রতিক কালের। ২০০৩ সালে ২৭% জীবাণু এজিথ্রোমাইসিন-প্রতিরোধক ছিলো। তুলনামূলকভাবে এ-হার ২০০২ সালে ছিলো ৫% এবং তার আগে ১৯৯৯ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত মোটেই প্রতিরোধক ছিলো না। ২০০৩ সালে যতগুলো জীবাণু সনাক্ত করা হয়েছিলো তার সবগুলিই কোট্রিমোক্সাজোল-প্রতিরোধক ছিলো (সারণি ১)।

সারণি ১: জীবাণুনাশক ওষুধের প্রতি মেনিনজাইটিস-এর জীবাণুর সংবেদনশীলতার ধরন, ১৯৯৯-২০০৩

বছর	প্রতিরোধের শতকরা হার						
	এম্পিসি.	ক্লোরাম.	পেনিসি.	সিপ্রো.	সেফট্রি.	এজিথ্রো.	কোট্রিমো.
১৯৯৯-২০০১	০	০	০	০	০	০	৮০
২০০২	০	০	০	০	০	৫	৮৯
২০০৩	০	০	০	০	০	২৭	১০০

প্রতিবেদক: ল্যাবরেটরি সায়েন্সেস ডিভিশন এবং হেলথ সিস্টেমস্ এ্যাণ্ড ইনফেক্সাস ডিজিজেজ ডিভিশন, আইসিডিডিআর,বি

অর্থানুকুল্য: আইসিডিডিআর,বি

মন্তব্য

বিশ্বব্যাপী ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিসের একটা প্রধান কারণ হচ্ছে *নাইসিরিয়া মেনিনজাইটিডিস* এবং ব্যাকটেরিমিয়ার সবচেয়ে মারাত্মক প্রাণঘাতী উপকরণগুলোর একটি হচ্ছে মেনিঙ্গোকোক্কেমিয়া। মহামারী ঘটাতে সক্ষম মেনিঙ্গোকোক্কাল রোগের আক্রমণের হার অনেক বেশি

হতে পারে, বিশেষ করে আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চলে এ-রোগের বিস্তৃতি এবং ফলাফল ব্যাপক এবং সুদুরপ্রসারী (১)। হজ্জের মতো বড় ধরনের সমাবেশের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রাদুর্ভাব জনস্বাস্থ্যের জন্য বড় রকমের চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়, কারণ আক্রান্ত ব্যক্তিগণ বাড়িতে ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে এবং এভাবে বহু দেশে এ-রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে (২)। হজ্জ-সংশ্লিষ্ট সাম্প্রতিক মহামারী সৃষ্টিতে *নাইসিরিয়া মেনিনজাইটিডিস*-এর সেরোগ্রুপ 'ডব্লিউ-১৩৫'-এর সাথে সেরোগ্রুপ 'এ'-এর সম্পৃক্ততা ছিলো (২,৩); যে-সেরোগ্রুপটি (সেরোগ্রুপ-'এ') আইসিডিডিআর,বি-তে সনাক্তকৃত প্রায়-সবগুলো রোগীর দেহে পাওয়া গেছে।

আইসিডিডিআর,বি হাসপাতাল শুধুমাত্র ডায়রিয়া রোগী ভর্তি করে। এই প্রতিবেদনের সময়কালেও এ-নিয়মের পরিবর্তন হয় নি। ফলে ইনভ্যাসিভ মেনিঙ্গোকোক্কাল রোগে আক্রান্ত রোগী সনাক্ত করার ক্ষেত্রে এটা একটা সীমাবদ্ধতা ছিলো। তা সত্ত্বেও মেনিঙ্গোকোক্কেমিয়া এবং মেনিঙ্গোকোক্কাল মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২০০২ এবং ২০০৩ সালে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি পাওয়া গেছে। এ-প্রতিবেদনের ফলাফল থেকে বোঝা যায় যে *নাইসিরিয়া মেনিনজাইটিডিস* বাংলাদেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ জীবাণু হয়ে উঠছে। ঢাকা ও বাংলাদেশের অন্যান্য হাসপাতালেও বর্ধিত হারে মেনিঙ্গোকোক্কাল রোগীর আগমন ঘটছে কি না তা জানার জন্য আরো তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

মেনিঙ্গোকোক্কাল রোগ নিরাময়ের জন্য কার্যকর ভ্যাকসিন রয়েছে (৪)। এ-রোগের ঝুঁকির পরিধি-সম্পর্কিত আরো তথ্যাবলি বাংলাদেশে এই ভ্যাকসিন ব্যবহারের ভূমিকা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করতে পারে।

তথ্যসূত্রের জন্য ইংরেজি সংস্করণ দেখুন

২০০৪ সালে ফরিদপুর জেলায় নিপা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের সময় ব্যক্তি-থেকে-ব্যক্তিতে এ-ভাইরাসের বিস্তার

২০০৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার ৩৬ জন বাসিন্দা নিপা ভাইরাসজনিত মস্তিষ্ক প্রদাহে (নিপা ভাইরাস এনসেফালাইটিস) আক্রান্ত হয়। এদের মধ্যে ২৭ জনের মৃত্যু হয়। ২০০৪ সালে এটি ছিলো নিপা ভাইরাসজনিত মস্তিষ্ক প্রদাহের দ্বিতীয় প্রাদুর্ভাব। এই সর্বশেষ প্রাদুর্ভাবের রোগতাত্ত্বিক (এপিডেমিওলজিক) বিশ্লেষণ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এ-রোগ ব্যক্তি-থেকে-ব্যক্তিতে বিস্তার লাভ করে, যা নিপা ভাইরাসের দ্বারা সৃষ্ট পূর্ববর্তী প্রাদুর্ভাবসমূহের ব্যতিক্রম। অন্ততপক্ষে ৬ জন রোগী তীব্র শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় আক্রান্ত (একিউট রেসপিরেটরি ডিসট্রেস সিনড্রোম) হয়েছিলো, যা ইতোপূর্বে নিপা ভাইরাস সংক্রমণের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রমাণিত হয় নি। রোগটিকে সার্থকভাবে প্রতিরোধের জন্য এর সংক্রমণের ঝুঁকির কারণ চিহ্নিতকরণের চেষ্টা অব্যাহত রাখা, হাসপাতালে রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা বৃদ্ধি এবং এ-ভাইরাস সম্পর্কে সমাজের ধারণা ও বিশ্বাস সম্বন্ধে অবগত হওয়া প্রয়োজন।

২০০৪ সালের ৫ এপ্রিল আইসিডিডিআর,বি এবং ইনস্টিটিউট অব এপিডেমিওলজি এ্যাণ্ড ডিজিজ কন্ট্রোল রিসার্চ (আইইডিসিআরকে) এই মর্মে সতর্ক করা হয় যে, বিগত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ফরিদপুর জেলার একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় বসবাসরত একই পরিবারভুক্ত এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে প্রাণঘাতী মস্তিষ্ক প্রদাহে (লেথাল এনসেফালাইটিস) ৬ জন মৃত্যুবরণ করেছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-এর অনুরোধে ৬ এপ্রিল এ-ব্যাপারে তদন্ত শুরু হয়। সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এ্যাণ্ড প্রিভেনশন–আটলান্টা, হেলথ কানাডা এবং মালয়েশিয়া থেকে আগত বিজ্ঞানীগণ পরে এ-দলে যোগ দেন।

যেসব রোগীর মধ্যে জ্বর এবং মানসিক অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে, সেসব রোগীদের রক্ত ও অন্যান্য শারীরিক নমুনা পরীক্ষা করে নিপা ভাইরাসকে প্রাদুর্ভাবটির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পর্যবেক্ষণ কর্মসূচি এবং রোগতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে ১৯ ফেব্রুয়ারিতে অসুস্থহওয়া প্রারম্ভিক রোগীটিসহ চূড়ান্তভাবে ফরিদপুর জেলার ৩৬ জন বাসিন্দাকে নিপা রোগে আক্রান্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয় (চিত্র ১)। এদের মধ্যে ২৭ জন (৭৫%) রোগী মারা যায়। অধিকাংশ রোগী ছিলো প্রাপ্তবয়স্ক এবং ৪ জনের (১১%) বয়স ছিলো ১৫ বছর বা তার চেয়ে কম। রোগীদের মধ্যে জ্বর এবং অচেতন অবস্থাসহ অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থা ছাড়াও প্রধানত কাশি, শ্বাসকষ্ট, মাথাব্যথা এবং বমির লক্ষণসমূহ দেখা গেছে। ৬ জন রোগীর বুকের এক্স-রে করা হয়েছিলো; সবগুলো এক্সরে'র উভয় ফুসফুসই ঘোলাটে দেখা গেছে, যা তীব্র শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যার (এ্যকিউট রেসপিরেটরি ডিসট্রেস সিনড্রোম) সাথে সংগতিপূর্ণ (চিত্র ২)।

ল্যাবরেটরি পরীক্ষার মাধ্যমে কোনো রোগীর সিরাম অথবা স্নায়ুরস-এ নিপা ভাইরাসের আইজিএম এন্টিবডির নিশ্চিত উপস্থিতি দেখা গেলে তাকে অতি-সাম্প্রতিক সংক্রমণ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। কোনো রোগীর মধ্যে জ্বর এবং মানসিক অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ করা গেলে এবং সে একজন নিশ্চিত রোগীর সাথে একই গ্রামে বসবাস বা তার সাথে কাজ করে থাকলে তাকে সম্ভাব্য নিপা রোগী হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। ৩৬ জনের মধ্যে ২৭ জনের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। এদের

মধ্যে ২৩ জন ছিলো ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় নিশ্চিত রোগী। ২৭ জনের মধ্যে ৪ জনের রক্তে নিপা ভাইরাসের এন্টিবডির মাত্রা নির্ধারণযোগ্য অবস্থায় ছিলো না। সম্ভবত রক্তে আইজিএম-এর উপস্থিতির (সেরোকনভারশন) পূর্বে রোগের শুরুতে এসব নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিলো। এদেরকে সম্ভাব্য রোগী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিলো, কারণ রোগ নিশ্চিতকরণের জন্য পরবর্তী নমুনা সংগ্রহের পূর্বেই এদের মৃত্যু হয়। এছাড়া আরো ৯ জন রোগী তাদের কাছ থেকে রোগ নির্ণয়ের নমুনা সংগ্রহের পূর্বেই মারা যায়। ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় নিশ্চিত নিপা রোগীর সাথে রোগতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে (এপিডেমিওলজিক্যালি) এদের সম্পর্ক ছিলো এবং ফলে তাদেরকেও সম্ভাব্য রোগী হিসেবে চিহ্নিত করা হয় (মোট সম্ভাব্য রোগী = ১৩ জন)। এ-তদন্ত চলাকালীন সময়ে কিছু রোগীর কাছ থেকে সংগৃহীত শ্লেষ্মা-নমুনা থেকেও আরটি-পিসিআর (RT-PCR) পরীক্ষার মাধ্যমে নিপা ভাইরাসের আরএনএ (RNA) সনাক্ত করা গেছে।

প্রাথমিক রোগতাত্ত্বিক তথ্য-প্রমাণগুলো (এপিডেমিওলজিক এভিডেন্স) থেকে পরিষ্কার ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আলোচ্য প্রাদূর্ভাবের সময় প্রাথমিকভাবে সম্ভবত হাঁচি-কাশির মাধ্যমে ব্যক্তি-থেকে-ব্যক্তির মধ্যে নিপা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে। রোগীরা সাতটি ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বসবাস করতো, কিন্তু তারা হয় একই বাড়িতে থাকতো কিংবা পারিবারিকভাবে সম্পর্কিত ছিলো। ৩৬ জন আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে ৩৩ জন (৯২%) তাদের অসুস্থতা শুরুর আগে অন্তত একজন নিশ্চিত অথবা সম্ভাব্য নিপা রোগীর সংস্পর্শে এসেছিলো। দু'জন ব্যক্তি (রোগী খ এবং গ) তাদের মরণাপন্ন ভাই (রোগী ক)-এর সংস্পর্শে আসার যথাক্রমে ৭ ও ১১ দিন পর তাদের মধ্যে নিপা ভাইরাস সংক্রমণের লক্ষণসমূহ দেখা দেয় এবং পরে তারাও মারা যায়। রোগী ক-এর অসুস্থতার শেষ পর্যায়ে (মৃত্যুর দিনে) তার মেয়ে (রোগী ঘ) ও তার স্বামী (রোগী ঙ) তাকে (ক-কে) দেখতে আসার যথাক্রমে ৬ ও ৮ দিন পর অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং তারাও মারা যায়। রোগী ক অসুস্থ হয়েছিলো ১৯ মার্চ (চিত্র ১) এবং তার কাছ থেকে ভাইরাসটি সম্ভবত তার অন্যান্য অনেক বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। অন্য একটি রোগীর (রোগী চ) পরবর্তী পর্যায়ে আক্রান্ত বিভিন্ন রোগীর সাথে যোগসূত্র ছিলো। যে মানুষটি রোগী চ-কে তার (চ-এর) অসুস্থতার সময় এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে হেঁটে যেতে সাহায্য করেছিলো এবং যে রিক্সাওয়ালা রোগী চ-কে হাসপাতালে বয়ে নিয়ে গিয়েছিলো তারা মাত্র একবার রোগী চ-এর সংস্পর্শে আসার যথাক্রমে ৯ ও ১০ দিন পর অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং উভয়েই মারা যায়। অসুস্থতার শুরুতে রোগী চ-কে তার বাড়ি থেকে কিছু দূরে তার বাবার বাড়িতে সেবা করা হয়। রোগী চ-এর বাবা এবং এক ভাবীও (যারা উভয়েই রোগী চ-এর সেবা-যত্ন করেছে) পরবর্তীকালে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। রোগী চ এবং তার বাবা মারা যায়।

চিত্র ১ ফরিদপুরে ২০০৪ সালের নিপা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের সময় সম্ভাব্য ও নিশ্চিত নিপা রোগীদের অসুখ শুরু হওয়ার তারিখ (সংখ্যা=৩৬)

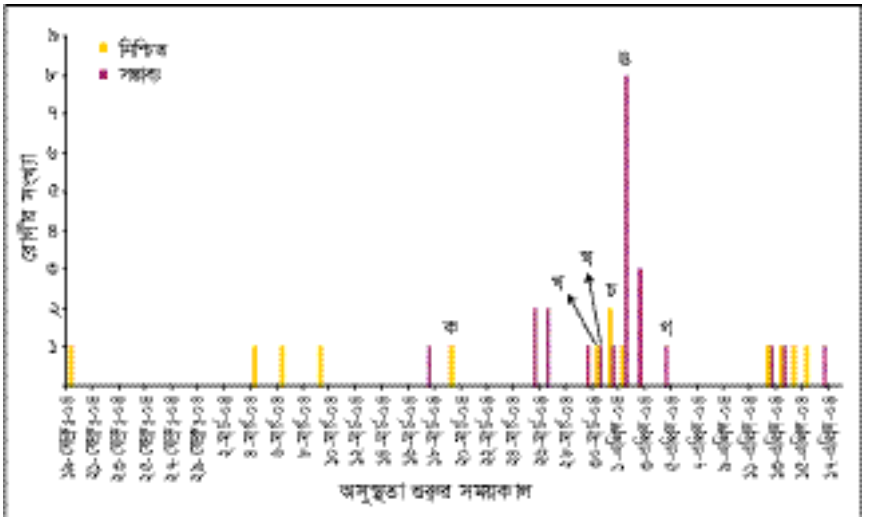

চিত্র ২: নিপা এনসেফালাইটিসে-আক্রান্ত দু'জন রোগীর এক্স-রে

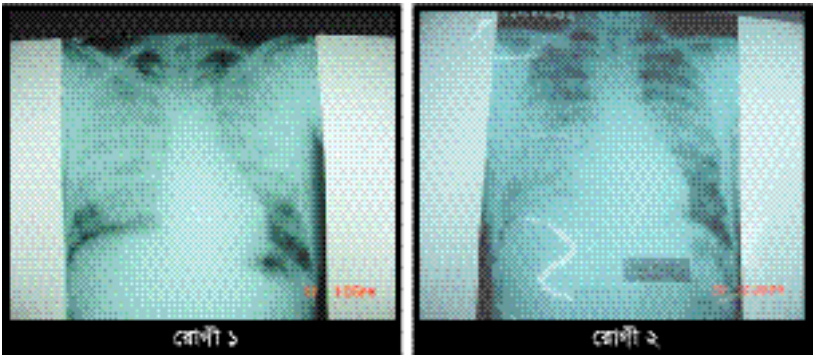

এ-প্রাদুর্ভাবের সময় ব্যক্তি-থেকে-ব্যক্তিতে সংক্রমণের যে প্রমাণ পাওয়া যায় তার ওপর ভিত্তি করে এবং বাংলাদেশে নিপা ভাইরাস সংক্রমণের প্রতিরোধ ও এর নিয়ন্ত্রণের জন্য দীর্ঘমেয়াদী পন্থা অবলম্বনের প্রয়োজনে আলোচ্য প্রাদুর্ভাবের সময়কার গবেষণার বিষয়াদি এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছিলো। পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং জনস্বাস্থ্য কার্যক্রমের মধ্যে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলো অর্ন্তভুক্ত থাকা দরকার : ১) রোগ-নিয়ন্ত্রণ এবং রোগীকে আলাদা করে রাখার তৎপরতা বাড়ানো; ২) স্থানীয় হাসপাতালেই রোগীর সহায়ক স্বাস্থ্যসবা প্রদান; ৩) বিশেষ ধরনের আচার-

ব্যবহার এবং মেলামেশার ধরন যা রোগ বিস্তারের জন্য বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে তা নির্ণয় করতে দীর্ঘমেয়াদী গবেষণা; ৪) ইন্ডিয়ান ফলখেকো বাদুড় (*টেরোপাস জাইগানটাস*) থেকে নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা; ৫) পরিবেশে ভাইরাসের উপস্থিতির পর্যবেক্ষণ; এবং ৬) জনগোষ্ঠীতে নিপা-সৃষ্ট রোগকে কিভাবে দেখা হয় এবং এর জন্য তারা কী ধরনের চিকিৎসা-সেবার শরণাপন্ন হয় তা আচরণগত গবেষণার মাধ্যমে পর্যালোচনা করা। আচরণগত গবেষণার ফলাফল স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রচার-কৌশল নির্ধারনে এবং কী তথ্য প্রচার করা হবে তা নিরূপণের কাজে ব্যবহৃত হবে।

প্রতিবেদক: ইনস্টিটিউট অব এপিডেমিওলজি এ্যাণ্ড ডিজিজ কন্ট্রোল, ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়; ফরিদপুর জেনারেল হাসপাতাল; বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা; হেলথ কানাডা; ডিভিশন অব ভাইরাল এ্যাণ্ড রিকেটশিয়্যাল ডিজিজেজ, ন্যাশনাল সেন্টার ফর ইনফেকশাস ডিজিজেজ, সিডিসি-আটলান্টা, যুক্তরাষ্ট্র; ল্যাবরেটরি সায়েন্সেস ডিভিশন, পাবলিক হেলথ সায়েন্সে ডিভিশন ও হেলথ্ সিস্টেমস এ্যাণ্ড ইনফেকশাস ডিজিজেজ ডিভিশন, আইসিডিডিআর,বি

অর্থানুকুল্য: সেন্টারস্ ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এ্যাণ্ড প্রিভেনশন-আটলান্টা, যুক্তরাষ্ট্র; হেলথ্ কানাডা; উইনিপেগ, কানাডা; কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা), ঢাকা; ইউনাইটেড স্টেটস্ এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি), ঢাকা

মন্তব্য

এই নিয়ে বাংলাদেশে এটি চতুর্থবারের মত স্বীকৃত নিপা ভাইরাসজনিত মস্তিষ্ক প্রদাহের (এনসেফালাইটিস) প্রাদুর্ভাব এবং ২০০৪ সালে এটা দ্বিতীয় প্রাদুর্ভাব (১)। এ-প্রতিবেদনের প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ থেকে বোঝা যায় যে, দু'টি উল্লেখযোগ্য কারণে এ-প্রাদুর্ভাব ছিলো ব্যতিক্রমী এবং দৃষ্টান্তমূলক। প্রথমত তথ্য-প্রমাণ সাপেক্ষে এটা মনে হয় যে, ব্যক্তি-থেকে-ব্যক্তিতে সংক্রমণের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে এ-রোগ ছড়িয়েছে। পূর্ববর্তী প্রাদুর্ভাবের সাথে জীব-জন্তুর যোগসূত্র পাওয়া গেছে এবং ব্যক্তি-থেকে-ব্যক্তির মাধ্যমে বিস্তারের সম্ভাবনা বাদ দেওয়া হয় নি, তবে এ-সম্বন্ধে পূর্বে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় নি (১-৩)। দ্বিতীয়ত এ-প্রাদুর্ভাবের সময় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রোগীর মধ্যে তীব্র শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা পরিলক্ষিত হয়েছে, যা পূর্ববর্তী নিপা ভাইরাস-আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে একটি প্রধান সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হয় নি।

ব্যক্তি-থেকে-ব্যক্তিতে নিপা ভাইরাস সংক্রমণের বিষয়টি জনসচেতনতা বৃদ্ধির গুরুত্ব এবং নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত সন্দেহভাজন রোগীকে দ্রুত আলাদাকরে হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়ে দেয়। তাছাড়া সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য যথোপযুক্ত অভ্যাস গঠন, হাসপাতালে রোগীকে আলাদা রাখার ব্যবস্থা এবং হাসপাতালের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা বাঞ্ছনীয়। যদিও অনেক রোগীই তাদের পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সেবা করতে গিয়ে নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে, স্বাস্থ্যকর্মীদের কাউকে নিপা ভাইরাসে সংক্রামিত হওয়ার তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় নি। স্বাস্থ্যকর্মীদের নিপা ভাইরাসে সংক্রামিত না-হওয়ার কতিপয় সম্ভাব্য ব্যাখ্যা আছে। এ-প্রাদুর্ভাবের সময় পরিবারের যেসব সদস্য রোগীর পরিচর্যাকারী হিসেবে কাজ করেছে তারা স্বাস্থ্যকর্মীদের চেয়ে সাধারণত রোগীর অনেক বেশি কাছে গিয়েছে। তাছাড়া নিপা ভাইরাস-আক্রান্ত অনেক রোগীই

চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে যায় নি, বা খুব স্বল্প-সময়ের জন্য হাসপাতালে ছিলো, আর এসব কারণে স্বাস্থ্যকর্মীদের উক্ত ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম ছিলো। সংক্রমণ প্রতিরোধ-ব্যবস্থাসম্বলিত আচরণবিধি (প্রটোকল) এবং রোগ প্রতিরোধের কার্যকর উপায় যথাক্রমে স্বাস্থ্যসেবা সংস্থায় এবং সমাজের সকল স্তরে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা অব্যাহত থাকলে পরিবেশ এবং মানুষ থেকে এ-রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনা কমে যাবে।

এ-প্রাদুর্ভাবের সময় সম্ভবত দু'টি উপায়ে নিপা ভাইরাস মানুষকে আক্রান্ত করেছে। ফলখেকো বাদুড়কে এ-রোগের একমাত্র বাহক হিসেবে চিহ্নিতকরণ অব্যাহত রয়েছে (১-৪)। এ-প্রাদুর্ভাব থেকে ধারণা করা হচ্ছে যে, মানুষের মধ্যে এ-ভাইরাসের আগমণের পরবর্তী পর্যায়ে ব্যক্তি-থেকে-ব্যক্তিতে এ-রোগের সংক্রমণ হয়েছে। কেবলমাত্র তিনজন রোগীর ক্ষেত্রে অসুস্থতা শুরুর পূর্বে কোনো নিপা ভাইরাস-আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে তাদের আসার ঘটনা জানা যায় নি এবং জানামতে এদের দুই জনের অন্য কোনো রোগীর সাথে সংস্রব ছিলো না। এ-রোগীরা বাদুড়ের লালা, মল বা মূত্রের মাধ্যমে আক্রান্ত হয়ে থাকতে পারে, তবে পরবর্তী রোগীগুলো সম্ভবত সংক্রামিত মানুষ থেকে নিঃসৃত তরলের সংস্পর্শে এসেছে। ফরিদপুরে প্রাদুর্ভাবের সময় রাজবাড়ীর আরেকজন রোগীকে নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী হিসেবে নিশ্চিত করা হয়। ঐ স্থানটি (রাজবাড়ী) ছিলো ইতোপূর্বেকার জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে সংঘটিত এ-রোগের প্রাদুর্ভাবের মূল জায়গা (১)। এবছর বাংলাদেশে সংঘটিত সুনির্দিষ্ট দু'টি প্রাদুর্ভাব ছাড়াও বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন জায়গা থেকে রোগী সনাক্ত করা হচ্ছে (১)।

নিপা-সংক্রান্ত অসুস্থতা বর্তমান সময়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বাংলাদেশে এমনিতেই যেখানে নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া এবং ডেঙ্গু রোগ জনস্বাস্থ্যের ওপর একটা বড় ধরনের প্রভাব ফেলে, সেখানে হঠাৎ-করে নিপা ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট রোগের কয়েকটি প্রাদূর্ভাবের ফলে উচ্চ মৃত্যুহার পরিবার এবং গ্রামগুলোতে ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। ধারণা করা হচ্ছে যে, বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে নিপা ভাইরাসজনিত রোগের একটি মহামারী অঞ্চল রয়েছে (সম্ভবত সেখানে সবসময় এ-রোগ হচ্ছে) এবং এ-অঞ্চলটিকে 'নিপা বলয়' হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। নিপা ভাইরাস বাহকের আচরণবিধি এবং জীবজন্তু-থেকে-জীবজন্তুতে এবং জীবজন্তু-থেকে-মানুষের মধ্যে নিপা ভাইরাস সংক্রমণ-পদ্ধতি জানার জন্য (বিশেষ করে ফলখেকো বাদুড়ের যৌনমিলন এবং তাদের গতিবিধি ও ভাইরাস ছড়ানো), আবহাওয়াজনিত ও পরিবেশগত ঘটনাবলি যা সংক্রমণের সাথে যুক্ত তা জানতে, এবং ভাইরাসের এন্টিজেনের সাথে বিশেষ এন্টিবডির ক্রিয়ার স্থান (এপিটোপ) যা ভাইরাসের রোগসংক্রমণের ক্ষমতা ও বিস্তারে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রাখে সেসব নিরুপণ করতে দীর্ঘমেয়াদী গবেষণা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। সর্বোপরি, রোগ প্রতিরোধের সঠিক অভ্যাসসমূহ, হাসপাতাল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং এই জীবাণু ও জীবাণুঘটিত রোগ সম্পর্কে এবং পরিশেষে এ-রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কিভাবে কমানো যায় সে সম্বন্ধে জনসচেতনতা বাড়ানো বিশেষভাবে প্রয়োজন।

তথ্যসূত্রের জন্য ইংরেজি সংস্করণ দেখুন

ডেঙ্গু হেমোরেজিক জ্বর সনাক্ত করতে বুক ও পেটের আলট্রাসাউন্ডের ব্যবহার

ডেঙ্গু ও ডেঙ্গু হেমোরেজিক জ্বরের পর্যবেক্ষণ কর্মসূচিতে দেখা যায় যে, ডেঙ্গু এবং ডেঙ্গু হেমোরেজিক জ্বরের বৈশিষ্ট্যসম্বলিত রোগী সনাক্ত করতে শারীরিক ও ল্যাবরেটরি পরীক্ষার সাথে বুক ও পেটের আলট্রাসাউন্ড একটি প্রয়োজনীয় অনুসংজ্ঞ। ডেঙ্গু হেমোরেজিক জ্বরের লক্ষণসম্বলিত রোগীদের ইতোপূর্বে এক বা একাধিকবার ডেঙ্গু ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি দেখা গেছে। বিষয়টি এ-ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ যে, ডেঙ্গুর কোনো একটি সেরোটাইপে আক্রান্ত কোনো ব্যক্তি যদি পরবর্তীকালে ডেঙ্গুর অন্য কোনো সেরোটাইপে আক্রান্ত হয়, তবে তা তাকে মারাত্মকভাবে অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়। ডেঙ্গু বাংলাদেশে তাৎপর্যপূর্ণ এক জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে বিরাজমান। ফলে এ-রোগের বিস্তার রোধ করতে এবং যাতে আরো অধিক হারে এ-রোগে আক্রান্ত রোগী চিকিৎসা-সুবিধা ও সহায়ক-সেবা গ্রহণ করতে এগিয়ে আসে তার জন্য প্রয়োজনীয় কলা-কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন জরুরী।

২০০০ সাল থেকে বাংলাদেশে ডেঙ্গু এবং ডেঙ্গু হেমোরেজিক জ্বর একটি জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে স্বীকৃত (১), যা বিগত বছরগুলোতে সম্ভবত অসনাক্ত এক সমস্যা হিসেবে বিরাজমান ছিলো (২)। ডেঙ্গু থেকে ডেঙ্গু হেমোরেজিক জ্বরের পার্থক্য বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, কেননা ডেঙ্গু হেমোরেজিক জ্বরের ক্ষেত্রে সার্বক্ষণিক ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা মৃত্যুর ঝুঁকি ও জটিলতা কমাতে পারে। ২০০২ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতালে সন্দেহভাজন ডেঙ্গু রোগীর ক্ষেত্রে বুক ও তলপেটের আলট্রাসাউন্ড নিয়মিত পরীক্ষা হিসেবে সংযোজন করা হয় (৩)। এই পদ্ধতি বুক ও পেটে তরল পদার্থের উপস্থিতি (যা ডেঙ্গু হেমোরেজিক জ্বরের একটি বৈশিষ্ট্য) নির্ণয়ে একটি কার্যকর পদ্ধতি কি না তা নির্ণয় করতে ব্যবহৃত হয়েছিলো।

পর্যবেক্ষণে অংশগ্রহণে সম্মত প্রতিটি সন্দেহভাজন ডেঙ্গু রোগীর রোগতাত্ত্বিক ও লক্ষণভিত্তিক (এপিডেমিওলজিক ও ক্লিনিক্যাল) তথ্যসমূহ নিয়মতান্ত্রিকভাবে সংগ্রহ করা হয়। ক্যাপচার এলিসার মাধ্যমে রক্তের সিরামে ডেঙ্গু ভাইরাসের আইজিজি ও আইজিএম এন্টিবডির উপস্থিতি পরীক্ষা করা হয় (৪)। জ্বরে আক্রান্ত রোগীর রক্তে যদি ৪০ ইউনিট বা তার চেয়ে বেশি আইজিজি বা আইজিএম এন্টিবডি থাকে, তাহলে তাকে ডেঙ্গু জ্বরের রোগী হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। আইজিএম এবং আইজিজি-এর আনুপাতিক হার যদি ১.৮ বা এর থেকে বেশি হয়, তাহলে তাকে প্রাথমিক সংক্রমণ (প্রথমবার আক্রান্ত) এবং এ-হার যদি ১.৮-এর কম হয়, তাহলে তাকে দ্বিতীয় সংক্রমণ (পূর্বে আক্রান্ত) হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয় (৪)। জ্বরের সাথে রক্তক্ষরণজনিত লক্ষণসমূহের যেকোনো একটি পরিলক্ষিত হলে (যেমন, পজিটিভ টারনিকেট পরীক্ষা, ত্বকের উপরে ছোট ছোট লাল ফুসকুড়ি, বা ত্বকের নিচে ছোট ছোট রক্তক্ষরণের কালো চিহ্ন; পরিপাক নালী, মিউকোসা এবং সূঁচ-ফোটানো স্থান বা অন্য যেকোনো স্থান থেকে রক্তক্ষরণ); রক্তে অণুচক্রিকার (প্লাটিলেট) পরিমাণ কমে গেলে (প্রতি ঘনমিটারে ১০০,০০০ কোষ বা এর কম); আলট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে রক্তরস বের হয়ে যাওয়ার (প্লাজমা লিকেজ) লক্ষণ সনাক্ত করা গেলে [ফুসফুসে পানি-জমা (প্লিউরাল ইফিউসন) বা পেটে পানি-জমা (এসাইটিস) অথবা হৃৎপিণ্ডের আবরণীতে পানি-জমা (পেরিকার্ডিয়াল ইফিউসন)] এবং এসবের সাথে যদি কোনো রোগীর এন্টিবডির পরিমাণ (টাইটার) ডেঙ্গু সংক্রমণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়, তাহলে তাকে ডেঙ্গু হেমোরেজিক জ্বর হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয় (৫)।

পর্যবেক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে সনাক্তকৃত ৮৩৩ জন সম্ভাব্য ডেঙ্গু রোগীর মধ্যে ৬২৪ জনকে ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় নিশ্চিত ডেঙ্গু হিসেবে সনাক্ত করা হয় এবং এদের ৩ জন (০.৪৮%) মারা যায়।

৮০৫ জন (৯৬.৬%) সম্ভাব্য ডেঙ্গু রোগীর আল্ট্রাসাউন্ড করা হয় যার ওপর ভিত্তি করে নিম্নোক্ত প্রতিবেদনটি তৈরি হয়েছে। এই ৮০৫ জনের মধ্য থেকে ডেঙ্গু এন্টিবডির উপস্থিতির মাধ্যমে ৬০৩ জনের (৭৪.৯%) মধ্যে ডেঙ্গুর সংক্রমণ নিশ্চিত করা হয়েছে। অধিকাংশ (৭৬%) ডেঙ্গু রোগী ছিলো পুরুষ। পূর্ববর্তী ফলাফলের অনুরূপ যাদের মধ্যে ডেঙ্গু রোগ সনাক্ত করা যায় নি, তাদের থেকে ডেঙ্গু-আক্রান্ত রোগীদের গড় মাসিক আয় ৬,০০০ টাকা বা ততোধিক হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো বেশি (৭৬.৪% বনাম ৬৮.৮%; পি ০.০৩) এবং যারা ডেঙ্গু-আক্রান্ত ছিলো না তাদের চেয়ে ডেঙ্গু-আক্রান্ত রোগীদের শিক্ষাজীবন ১০ বছরের অধিক হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো বেশি (৫৩.৯% বনাম ৩৭.৭%; পি <০.০০১) (সারণি ১) (৩)। পর্যায়ক্রমে ২৪৫ জন (৪০.৬%) রোগীকে ডেঙ্গু হেমোরেজিক জ্বরে-আক্রান্ত বলে নিশ্চিত করা হয়েছে। ৪৯০ জন (৮১.৩%) ডেঙ্গু রোগীর টারনিকেট পরীক্ষা পজিটিভ ছিলো, পক্ষান্তরে যাদের ডেঙ্গু ছিলো না তাদের মধ্যে ৯৩ জন (৪৭.৯%) রোগীর টারনিকেট পরীক্ষা পজিটিভ ছিলো [আপেক্ষিক ঝুঁকি (রিলেটিভ রিস্ক) = ১.৭, ৯৫%, কনফিডেন্স ইন্টারভেল = ১.৫-২.০]।

৩০৭ জন (৫০.৯%) ডেঙ্গু রোগীর সেরাস গহ্বরে যে তরল পদার্থের উপস্থিতি দেখা গেছে, তা আলট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে সনাক্ত করা হয়েছে। ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় নিশ্চিত হয় নি এমন রোগীর চেয়ে ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় নিশ্চিত ডেঙ্গু রোগীর মধ্যে ফুসফুসে পানি-জমা (৪২.৫% বনাম ১২.৪%; পি <০.০০১), পেটে পানি-জমা (৪০.৩% বনাম ১৮.৩%; পি <০.০০১) এবং পিত্তথলির দেয়াল পুরু (থিকেন্ড গলব্লাডার ওয়াল) (৩৪.৩% বনাম ১৯.৩%; পি >০.০০১) হতে বেশি দেখা গেছে (সারণি ১)।

সারণি ১: ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় নিশ্চিত ডেঙ্গু রোগীদের সাথে একইরকম অসুস্থতার লক্ষণযুক্ত কিন্তু পরীক্ষাগারে ডেঙ্গু নিশ্চিত না-হওয়া রোগীদের আলট্রাসাউন্ড পরীক্ষার তুলনামূলক তথ্য

প্রাপ্ত তথ্যসমূহ	ডেঙ্গু রোগী (মোট রোগী=৬০৩) সংখ্যা (%)	ডেঙ্গু নয় এমন রোগী (মোট রোগী=২০২) সংখ্যা (%)	আপেক্ষিক ঝুঁকি (রিলেটিভ রিস্ক)	৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল	পি মান
আলট্রাসাউন্ড দ্বারা প্রমাণিত রক্তরস বের হয়ে-যাওয়া[১] (প্লাজমা লিকেজ)	৩০৭ (৫০.৯)	৪৪ (২১.৮)	২.৩	১.৮-৩.১	<০.০০১
ফুসফুসে পানি-জমা (প্লিউরাল ইফিউসন)	২৫৬ (৪২.৫)	২৫ (১২.৪)	৩.৪	২.৩- ৫.০	<০.০০১
হৃৎপিণ্ডের আবরণীর মধ্যে পানি-জমা (পেরিকার্ডিয়াল ইফিউসন)	২ (০.৩৩)	০ (০.০০)	-	-	-
পেটে পানি-জমা (এসাইটিস)	২৪৩ (৪০.৩)	৩৭ (১৮.৩)	২.২	১.৬-৩.০	<০.০০১
যকৃত বড়-হওয়া (হেপাটোমেগালি)	১৯৬ (৩২.৫)	৭৪ (৩৬.৬)	০.৯	০.৭- ১.১	০.২৮২
প্লিহা বড়-হওয়া (ইসপ্লিনোমেগালি)	১১৩ (১৮.৭)	৩৩ (১৬.৩)	১.২	০.৮- ১.৬	০.৪৪৩
পিত্তথলির দেয়াল পুরু-হওয়া (থিকেন্ড গলব্লাডার ওয়াল)	২০৭ (৩৪.৩)	৩৯ (১৯.৩)	১.৮	১.৩-২.৪	<০.০০১

[১]রক্তরস বের হয়ে-যাওয়া: আলট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে ফুসফুসের আবরণী (প্লিউরা) বা পেটের ভিতরের আবরণী (পেরিটোনিয়াম) বা হৃৎপিণ্ডের আবরণীর (পেরিকারডিয়াম) মধ্যে যেকোনো তরলের উপস্থিতি সনাক্ত করা

১৫৭ জন (২৬%) রোগীকে প্রাথমিকভাবে সংক্রামিত (প্রথমবার ডেঙ্গু ভাইরাস-আক্রান্ত) এবং ৪৪৬ জন (৭৪%) রোগীকে দ্বিতীয়বার সংক্রামিত বলে সন্দেহ করা হয়েছিলো (এন্টিবডির পরিমাণগত তুলনার ওপর ভিত্তি করে)। যারা প্রথমবার সংক্রামিত হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে, তাদের তুলনায় দ্বিতীয়বার সংক্রামিত রোগীর ফুসফুসে পানি জমা-হওয়া (৫০.৭% বনাম ১৯.১%; পি <০.০০১), পেটে পানি-জমা (৪৬.৯% বনাম ২১.৭%; পি ≤০.০০১), পিত্তথলির দেয়াল পুরু হয়ে-যাওয়া (৪১.৭% বনাম ১৩.৪%; পি <০.০০১) এবং যকৃত বড় (হেপাটোমেগালি) হয়ে-যাওয়ার (৩৫.০% বনাম ২৫.৫%; পি ০.০৩) সম্ভাবনা বেশি বলে প্রমাণিত হয়েছে (সারণি ২)। ডেঙ্গু হেমোরেজিক জ্বরে আক্রান্তদের মধ্য থেকে ৮৮.২% রোগীর মধ্যে দ্বিতীয়বার সংক্রমণের প্রমাণ পাওয়া গেছে। পক্ষান্তরে, ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্তদের মধ্য থেকে ৬৪.২% রোগীর ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার সংক্রমণের প্রমাণ পাওয়া গেছে (আপেক্ষিক ঝুঁকি = ১.৩; ৯৫%, কনফিডেন্স ইন্টারভেল = ১.৩-১.৫, পি <০.০০১)।

সারণি ২: প্রথমবার সংক্রামিত ডেঙ্গু রোগীর সাথে দ্বিতীয়বার সংক্রামিত রোগীর আলট্রাসাউন্ড দ্বারা নিরূপিত তথ্যের তুলনা

প্রাপ্ত তথ্যসমূহ	প্রাথমিক সংক্রমণ (মোট রোগী=১৫৭) সংখ্যা (%)	দ্বিতীয় সংক্রমণ (মোট রোগী=৪৪৬) সংখ্যা (%)	আপেক্ষিক ঝুঁকি	৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল	পি মান
যেকোনো ধরনের রক্তরস বের হয়ে-যাওয়া	৪৪ (২৮.০)	২৬৩ (৫৯.০)	২.১	১.৬-২.৭	<০.০০১
ফুসফুসে পানি-জমা	৩০ (১৯.১)	২২৬ (৫০.৭)	২.৭	১.৯-৩.৭	<০.০০১
পেটে পানি-জমা	৩৪ (২১.৭)	২০৯ (৪৬.৯)	২.২	১.৬-৩.০	<০.০০১
পিত্তথলির দেয়াল পুরু-হওয়া	২১ (১৩.৪)	১৮৬ (৪১.৭)	৩.১	২.১-৪.১	<০.০০১
যকৃত বড়-হওয়া	৪০ (২৫.৫)	১৫৬ (৩৫.০)	১.৪	১.০-১.৮	০.০২৯
প্লিহা বড়-হওয়া	২৯ (১৮.৫)	৮৪ (১৮.৮)	১.০	০.৭-১.৫	০.৯২০

আলট্রাসাউন্ড পরীক্ষায় যাদের রক্তরস বের হয় নি বলে জানা গেছে, তাদের তুলনায় যাদের রক্তরস বের হওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে সেসব ডেঙ্গু রোগীদের রক্তে অণুচক্রিকার পরিমাণ প্রতি ঘনমিটারে ৫০,০০০ বা তার চেয়ে কম এবং টারনিকেট পরীক্ষা পজিটিভ হওয়ার সম্ভাবনা সাধারণত বেশি পাওয়া গেছে (সারণি ৩)।

সারণি ৩: ডেঙ্গু জ্বরে রক্তরস বের-হওয়ার সাথে অণুচক্রিকা কমে-যাওয়া ও টারনিকেট পরীক্ষার ফলাফলের সম্পর্ক

বিষয়	রক্তরস বের হওয়া রোগী (মোট রোগী=৩০৭) সংখ্যা (%)	রক্তরস বের না হওয়া রোগী (মোট রোগী=২৯৬) সংখ্যা (%)	আপেক্ষিক ঝুঁকি	৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল	পি মান
অণুচক্রিকার সংখ্যা ≤৫০,০০০/ঘন মি.মি.	১৭৮ (৫৮.০)	৯৫ (৩২.১)	১.৮	১.৫-২.২	<০.০০১
টারনিকেট পরীক্ষা[১] ≥২০/বর্গ ইঞ্চি	২৫৮ (৮৬.০)	২১৭ (৭৫.৯)	১.১	১.০-১.২	০.০০২

[১]১৭ জন রোগী টারনিকেট পরীক্ষার মাঝামাঝি সময়ে ব্যথার কারণে পরীক্ষাটি শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে অস্বীকৃতি জানান (মোট সংখ্যা = ৫৮৬ জন, এদের মধ্যে ৩০০ জন রক্তরস বের-হওয়া গ্রুপের এবং ২৮৬ জন রক্তরস বের না-হওয়া গ্রুপের)।

প্রতিবেদক: ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল; হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতাল; এবং ল্যাবরেটরি সায়েন্সেস ডিভিশন, হেলথ্ সিস্টেমস এ্যাণ্ড ইনফেকশাস ডিজিজেজ ডিভিশন, ক্লিনিক্যাল সায়েন্সেস ডিভিশন, আইসিডিডিআর,বি

অর্থানুকুল্য: কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি এবং আর্মড ফোর্সেস রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্সেস, ব্যাংকক, থাইল্যান্ড

মন্তব্য

২০০৩ সালে ডেঙ্গুর প্রকোপ বিগত তিন বছরের তুলনায় যদিও কম ছিলো (অপ্রকাশিত তথ্য, আইসিডিডিআর,বি), তথাপি ঢাকা এবং বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার জন্য এটি এখনো একটি উল্লেখযোগ্য জনস্বাস্থ্য সমস্যা। সীমিত স্বাস্থ্যসেবা সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য হাসপাতালে চিকিৎসাধীন যেসব রোগীর নিবিড় সহায়ক ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন তাদের চিহ্নিত করতে মারাত্মক রোগের প্রারম্ভিক নির্দেশিকাসমূহ সহায়ক হতে পারে। এ-প্রতিবেদনে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ ইঙ্গিত করে যে, আলট্রাসাউন্ড দ্বারা বুক ও পেটে তরল পদার্থের উপস্থিতি নিরূপণের মাধ্যমে ডেঙ্গু হেমোরেজিক জ্বরের বৈশিষ্ট্যসম্বলিত রোগী সনাক্ত করা যেতে পারে।

ধারণা করা হয় যে, এন্টিবডি-নির্ভর ত্বরান্বিতকরণ (এন্টিবডি-ডিপেনডেন্ট এনহেন্সমেন্ট) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূর্বে এক বা একাধিক ডেঙ্গু ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত রোগী পরবর্তীকালে ডেঙ্গু ভাইরাসের অন্য কোনো সেরোটাইপ দ্বারা আক্রান্ত হলে তার ডেঙ্গু হেমোরেজিক জ্বর হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায় (৬)। বিকল্পভাবে, এন্টিবডির সাথে এক বা একই জাতীয় ভাইরাসের অন্য এন্টিজেনের প্রতিক্রিয়া (ক্রস-রিয়াকটিং এন্টিবডি), যা সম্ভবত প্রধান সাইটোকিনসমূহের অতিরিক্ত উৎপাদনের সাথে জড়িত, সরাসরি কৌশিক নালী (ক্যাপিলারী) এবং অণুচক্রিকা ধ্বংস করতে পারে – ফলশ্রুতিতে রক্তরস বের হয়ে যায় এবং রক্তে অণুচক্রিকার সংখ্যা কমে যায় (৭)। প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ এরকম ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ যে, পূর্বে ডেঙ্গু-সংক্রমণ হয় নি এমন ডেঙ্গু রোগীর তুলনায় এন্টিবডির প্যাটার্ণের ভিত্তিতে (ইতোপূর্বে ডেঙ্গু ভাইরাসে আক্রান্ত) দ্বিতীয়বার ডেঙ্গু-আক্রান্ত রোগীর শরীরে আলট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে রক্তরস বের হয়ে যাওয়ার প্রমাণ পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণের প্রধান পদ্ধতি হলো এডিস মশার প্রজননের উৎস কমানো (৮)। ডেঙ্গুজাতীয় জ্বরে অসুস্থ তবে ডেঙ্গু নয় এমন রোগীদের তুলনায় হাসপাতালে ভর্তি ডেঙ্গু রোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নততর বলে প্রতীয়মান হয়েছে। আরো তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা প্রয়োজন, যা অধিক আর্থিক সুযোগপ্রাপ্ত মানুষের সাথে এডিস মশার প্রজনন-উৎসের সংশ্লিষ্টতা সম্বন্ধে আরো পরিষ্কার ধারণা দিতে পারে। বাংলাদেশে ডেঙ্গু রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় কলা-কৌশলের সাথে ডেঙ্গু রোগের উৎস নির্মূল করার ব্যাপারে জনশিক্ষার ওপর গুরুত্ব অব্যাহত থাকা উচিত। পরীক্ষামূলক ভ্যাকসিন তৈরি হচ্ছে এবং এর দ্বারা একসময়ে হয়তো এই রোগটি নিয়ন্ত্রণের একটি উপায় বের হয়ে আসবে।

তথ্যসূত্রের জন্য ইংরেজি সংস্করণ দেখুন

সর্বশেষ পর্যবেক্ষণ

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা'র প্রতিসংখ্যায় পূর্ববর্তী সংখ্যায় প্রদত্ত পর্যবেক্ষণ-বিষয়ক উপাত্তের হালনাগাদ তথ্য পরিবেশন করা হয়। এই হালনাগাদকৃত সারণি এবং চিত্রগুলোতে প্রকাশনাকালীন সময়ে প্রাপ্ত সর্বশেষ পর্যবেক্ষণ কর্মসূচির তথ্যগুলো প্রতিফলিত হবে। আমরা আশা করছি, রোগ বিস্তারের বর্তমান ধরন এবং রোগের ওষুধ প্রতিরোধ সম্পর্কে আগ্রহী স্বাস্থ্যগবেষকদের কাছে এই তথ্যগুলো সহায়ক হবে।

জীবাণুনাশক ওষুধের প্রতি ডায়রিয়া জীবাণুর সংবেদনশীলতার অনুপাত: জুন ২০০৩-মে ২০০৪

জীবাণুনাশক ওষুধ	*শিগেলা* (সংখ্যা=৩১১)	*ভি. কলেরি* ০১ (সংখ্যা=৬৩০)	*ভি. কলেরি* ০১৩৯ (সংখ্যা=৭)
ন্যালিডিক্সিক এসিড	৪৭.৯	পরীক্ষা করা হয় নি	পরীক্ষা করা হয় নি
মেসিলিনাম	৯৯.০	পরীক্ষা করা হয় নি	পরীক্ষা করা হয় নি
এম্পিসিলিন	৪৭.৬	পরীক্ষা করা হয় নি	পরীক্ষা করা হয় নি
টিএমপি-এসএমএক্স	৩৫.৭	০.২	১০০.০
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	১০০.০	১০০.০	১০০.০
টেট্রাসাইক্লিন	পরীক্ষা করা হয় নি	১০০.০	১০০.০
ইরিথ্রোমাইসিন	পরীক্ষা করা হয় নি	৯৯.৮	১০০.০
ফুরাজোলিডিন	পরীক্ষা করা হয় নি	০.২	১০০.০

৮৬ টি এম. টিউবারকিউলোসিস *জীবাণুর ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ধরন: এপ্রিল-ডিসেম্বর ২০০৩*

ওষুধ	প্রতিরোধের ধরন		
	প্রাইমারী (সংখ্যা=৬৯)	একোয়ার্ড * (সংখ্যা=১৭)	মোট (সংখ্যা=৮৬)
স্ট্রেপটোমাইসিন	৪১ (৫৯.৪)	১০ (৫৮.৮)	৫১ (৫৯.৩)
আইসোনায়াজিড (আইএনএইচ)	১০ (১৪.৫)	৫ (২৯.৪)	১৫ (১৭.৪)
ইথামবিউটল	১ (১.৪)	২ (১১.৮)	৩ (৩.৫)
রিফাম্পিসিন	২ (২.৯)	১ (৫.৯)	৩ (৩.৫)
এমডিআর (আইএনএইচ+রিফামপিসিন)	২ (২.৯)	১ (৫.৯)	৩ (৩.৫)
অন্যান্য ওষুধ	৪২ (৬০.৯)	১০ (৫৮.৮)	৫২ (৬০.৫)

( ) শতকরা হার

*১ মাস বা তার চেয়ে বেশি সময় ধরে যক্ষার ওষুধ গ্রহণ করেছে

প্রতিমাসে প্রাপ্ত ভি. কলেরি *০১,* ভি. কলেরি *০১৩৯, এবং* শিগেলা*-এর তুলনামূলক চিত্র: জুন ২০০৩-মে ২০০৪*

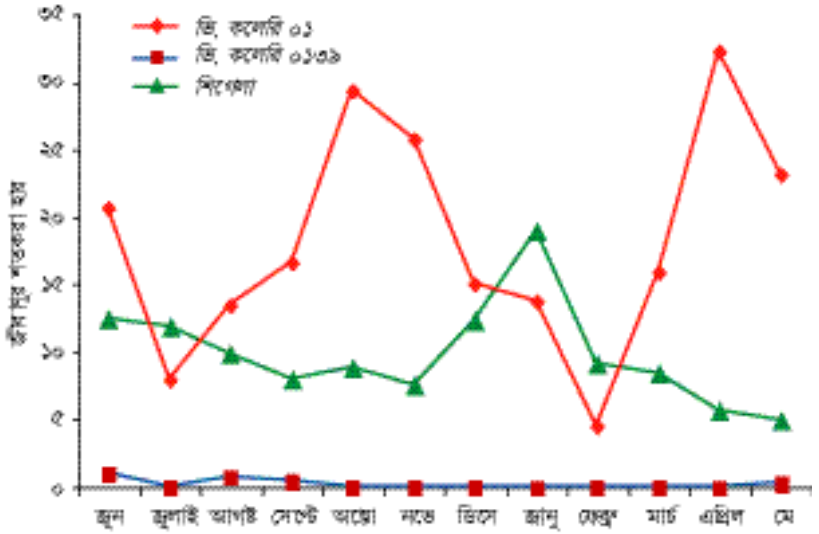

জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে এন. গনোরিয়া *জীবাণুর (%) সংবেদনশীলতা: জানুয়ারি-মার্চ ২০০৪ (সংখ্যা=১৮)*

জীবাণুনাশক ওষুধ	সংবেদনশীল (%)	কম সংবেদনশীলতা (%)	রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা (%)
এ্যাজিথ্রোমাইসিন	১০০.০	০.০	০.০
সেফট্রিয়াক্সোন	১০০.০	০.০	০.০
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	০.০	০.০	১০০.০
পেনিসিলিন	০.০	১৬.৭	৮৩.৩
স্পেক্টিনোমাইসিন	৮৩.৩	১৬.৭	০.০
টেট্রাসাইক্লিন	০.০	০.০	১০০.০
সেফিক্সিম	১০০.০	০.০	০.০

উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বাস্থ্যসমস্যা নিরসনে আইসিডিডিআর,বি-র অংগীকারের সাথে সহমর্মী দেশ ও সংস্থাগুলোর কাছ থেকে আইসিডিডিআর,বি অবারিতভাবে আর্থিক সহায়তা পেয়ে আসছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, বেলজিয়াম, কানাডা, জাপান, নেদারল্যান্ড, সুইডেন, শ্রীলংকা, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সাহায্য সংস্থা।

ছবি : গোয়ালন্দে খেজুরের রস সংগ্রহ, সৌজন্যে - এমিলি গারলী

সম্পাদকমন্ডলি
রবার্ট ব্রাইম্যান
পিটার থর্প
এম সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
এমএ রহীম

সম্পাদনা বোর্ড
চার্লস লারসন
এমিলি গারলী

যারা লেখা দিয়েছেন
আনোয়ার হোসেন
জাহাঙ্গীর হোসেন
এমিলি গারলী

কপি সম্পাদনা
এম সিরাজুল ইসলাম মোল্লা

বাংলা অনুবাদ
আনোয়ার হোসেন
জাহাঙ্গীর হোসেন

পেজ লে-আউট, ডেস্কটপ ও প্রি-প্রেস প্রসেসিং
মাহবুব-উল-আলম

আইসিডিডিআর,বি: সেন্টার ফর হেলথ্ এ্যান্ড পপুলেশন রিসার্চ
জিপিও বক্স নং ১২৮
ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
www.icddrb.org